বিজয় দিবস
সাদাসিধে কথা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ফিরে দেখা

ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। আমরা যারা সত্যিকারের বিজয় দিবসটা দেখেছিলাম, এই মাসে সেই ঐতিহাসিক এবং প্রায় অলৌকিক সেই দিনটির কথা ঘুরে-ফিরে বারবার আমাদের মনে পড়বেই। কী তীব্র ছিল সেই আনন্দের অনুভূতি! আমার মনে হয়, আমরা বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান জাতিগুলোর একটি। একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় এ রকম তীব্র আনন্দ আর কোনোভাবে কি অনুভব করতে পারে?

ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। কারণ, এই মাসে মন্ত্রী না হয়েও গাড়িতে পতাকা লাগানো যায়। আমাদের দেশের মন্ত্রীরা অবশ্য খুব অনুকরণীয় চরিত্র নন, তাঁদের অনেকেই এখন কারাগারে। আদর্শিক কোনো কারণে নয়, টাকা-পয়সা চুরির অভিযোগে। যাঁরা গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগান, তাঁরা সেটি করেন নিজের দেশের জন্য এক ধরনের মমতা থেকে, এই পতাকার জন্য যত মানুষ আত্মত্যাগ করেছে, বুকের রক্ত দিয়েছে, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে তত মানুষই নেই!

ডিসেম্বর মাসটা একটা অন্য রকম। তার কারণ, এই মাসটাতে শুধু যে বিজয় দিবস আছে তা নয়, এই মাসটাতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বলেও একটা দিবস আছে। আমাদের মনে হয়, এই মাত্র সেদিনের ঘটনা, যেদিন মুক্ত বাংলাদেশের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খবর পেয়েছিলাম এই দেশের সব বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষককে রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে গেছে আলবদরের দল। তখনো সবাই ভাবছে, তাঁদের বুঝি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে সত্যিই পাওয়া গেল, তবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়, বধ্যভূমিতে, মৃত। হ্যাঁ, এটি সেই বদর বাহিনী, যে বদর বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদ।

হ্যাঁ, ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। সারা বছর মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা মনে না করলেও যে মাসে সবাই একবার হলেও মনে করে। এই দেশে এখনো যেসব রাজাকার ঘুরে বেড়ায়, তারা এই ডিসেম্বর মাসে গর্তে লুকিয়ে থাকে। চট করে তারা মাথা বের করে না, তারা মুখ খোলে না।

২.

এই ডিসেম্বর মাসে আমরা আরও একটা কাজ করি, পেছন ফিরে তাকিয়ে সারা বছরের একটা হিসাব নিই। এই বছরের হিসাবটা শুরু হয়েছিল নাটকীয়ভাবে ১১ জানুয়ারি দিয়ে। তখন সবাই ভেবেছিল সারা বছরের হিসাবটা হবে স্বচ্ছ আর সহজ। এখন মনে হচ্ছে, হিসাবটা এত সহজ নয়, কোথাও কোথাও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

এই বছরে যেসব বড় কাজ হয়েছে, আমার মনে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়ের পাঠ্য বইগুলোতে দেশের সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরা। শেষ পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ে জাতির জনক এবং বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঢোকানো হয়েছে। বেঁচে থাকতে জিয়াউর রহমান যে দাবি করেছিলেন, ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে তিনি পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন, সেই কথাটিও এসেছে। একাত্তরের নয় মাস যে রাজাকার, আলবদর, আল-শামসরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেটা পাঠ্যবই থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল; সেই সত্যগুলো আবার পাঠ্য বইয়ে নতুন করে লেখা হয়েছে।

এই সরকারের অনেক কিছু নিয়েই আমাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে, অনেক কিছু নিয়ে আমাদের আশাভঙ্গও হয়েছে। কিন্তু পাঠ্য বইগুলোতে সত্যিকার ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই দেশটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে আমরা আর

কাউকেই সাদা চোখে বিচার করতে পারি না। মানুষটার মুখের কথা শুনে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করি সে কী আওয়ামীপন্থী নাকি বিএনপি-জামায়াতপন্থী! বিভক্তিটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে কেউ খোদা হাফেজ বলছে না, আল্লাহ হাফেজ বলছে, সেই কারণটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এ রকম অবস্থায় একটা রাজনৈতিক সরকার তার আমলে পাঠ্য বইয়ে ১০০ ভাগ সত্যি কথা লিখলেও অনেক মানুষ সেই কথাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করত। এই সরকারের সেই সমস্যা নেই। তারা ইতিহাসের যে কথাগুলো পাঠ্য বইয়ে লিখে যাবে, তার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। আমার ধারণা, এটি একটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যার চমৎকার একটা সমাধান হয়ে রইল।

পাঠ্য বইগুলো আমি এখনো নিজের চোখে দেখিনি, পত্রপত্রিকা পড়ে এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। কাজেই আরও কী কী লেখা আছে তা আমি জানি না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টাতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে আটক করে রেখেছিল। সেই সময় তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান যে রকম কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ঠিক সে রকম নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বকেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পাঠ্য বইয়ে এই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা খুব প্রয়োজন।

৩.

এ বছরের হিসাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে গত আগস্ট মাসের ছাত্র বিক্ষোভ। (এটা কাকতালীয় কি না কে জানে, আগস্ট মাসেই এই দেশের অঘটনগুলো ঘটে!) ছাত্রদের এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পর যেভাবে পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হলো, তা খুবই বিচিত্র। হঠাৎ করে মনে হলো, এ দেশের ছাত্র-শিক্ষকরা বুঝি সরকারের প্রতিপক্ষ। শুধু তা-ই নয়, সরকার বলতে আমরা কি ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারকে বোঝাই, নাকি মইন উ আহমেদের সেনাবাহিনীকে বোঝাই, সেটা নিয়েই সবার মধ্যে একটা বিভ্রান্তি শুরু হয়ে গেল–সেই বিভ্রান্তি আর দূর হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে কী ঘটেছে, তা এখনো সবার কাছেই একটা রহস্য। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি, সেখানে একটা গাছের পাতাও ছেঁড়া হয়নি কিন্তু তার পরও সেখানে ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। তাদের বেশির ভাগই পলাতক, সেই ছাত্র কিংবা তাদের বন্ধু-বান্ধবীরা মাঝেমধ্যে আমাকে ফোন করে জানতে চায়, তারা কী করবে। আমি তাদের কী বলব বুঝতে পারি না, যখন কাউকে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে, আমি তাদের কী বলব বুঝতে পারি না।

আদালতে মামলা উঠছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না। তার পরও তাদের দুই-তিন বছর জেল হয়ে যাচ্ছে। কারও মনে কোনো দ্বিধা নেই যে পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের হয়রানি। বেছে বেছে কেন ছাত্র আর শিক্ষকদের হয়রানি করার জন্য বেছে নেওয়া হলো, সেটাও আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের শিক্ষক থাকেন, সকল হয়রানি বেছে বেছে প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। মনে হচ্ছে, আমরা বুঝি দুই হাজার সাত সালে নই, আমরা বুঝি আছি আইয়ুব খান-মোনায়েম খানের আমলে।

শিক্ষক-ছাত্র নিগ্রহের নাটক এখনো শেষ হয়নি। রাজশাহীর শিক্ষকেরা ছাড়া পেয়েছেন, ঢাকার শিক্ষকেরা এখনো ছাড়া পাননি। মনে হচ্ছে, তাঁদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে এক ধরনের অসম্মান করানোর খুব ইচ্ছে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, অন্তত তাঁদের একটা শাস্তি দিয়ে তারপর দয়া করে ক্ষমা করে দেওয়ার এক ধরনের নাটক করা হতে পারে। আমরা সবাই খুব কৌতূহল নিয়ে এই নাটক দেখছি, শেষ দৃশ্যে কী অভিনয় হবে, কেউ এখনো আন্দাজ করতে পারছি না।

৪.
এ বছরের বড় আরেকটি ঘটনা হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন। এই দেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের সবাই এখন দেশের মাটিতে শুয়ে আছেন। যদি তাঁদের সবাইকে এক জায়গায় এনে একটা বীরশ্রেষ্ঠ কমপ্লেক্স তৈরি করা যেত, তাহলে কী চমৎকার একটা ব্যাপার হতো! সেই কমপ্লেক্সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থাকত, বীরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস থাকত, তাঁদের বীরত্বের কথা থাকত। আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখত, বুকের ভেতর দেশের জন্য একটা গভীর মমতা অনুভব করত। ব্যাপারটা কি খুবই কঠিন?

৫.
এ বছর আরেকটা বড় ঘটনা ঘটেছে; স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটা অত্যন্ত প্রবলভাবে উঠে এসেছে। হঠাৎ করে উঠে এসেছে তা নয়, এই দাবিটা উঠেছে খুব যুক্তিসংগত কারণেই। ঠিক কী কারণ ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম তারা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন। বদর বাহিনীর কমান্ডাররা বলছেন, এই দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। শুধু তা-ই নয়, উনিশ শ একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি মুক্তিযুদ্ধ নয়, একটা গৃহযুদ্ধ। সবচেয়ে আপত্তিকর বক্তব্যটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে, তাঁরা দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেননি। সুন্দরী মেয়ের লোভে, সহায়-সম্পত্তির লোভে তাঁরা অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছেন। উনিশ শত একাত্তর সালে পাকিস্তানের খবরের কাগজে হুবহু এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলা হতো– তাদের ভাষায়, মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন ভারতের চর এবং দুস্কৃতকারী। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে হঠাৎ করে এই দেশের যুদ্ধাপরাধীরা এত বড় দুঃসাহস কেমন করে পেল?
খুব সংগত কারণেই বদর বাহিনীর কমান্ডার আর স্বাধীনতাবিরোধীদের এ ধরনের বক্তব্যে দেশের মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।
দেশের সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা, সবাই এক হয়ে বলছেন, যা হওয়ার হয়েছে, আর নয়। এখন এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই! বিষয়টার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কারণ, জেনারেল মইন উ আহমেদ এবং প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ–দুজনেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথাটা বিবেচনায় এনেছেন। দেশের মানুষ এক ধরনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখার জন্য শেষ পর্যন্ত কী হয়।
কয়েক দিন আগে আমার কাছে একটা ই-মেইল এসেছে। যেখানে দুটি লিংক দেওয়া আছে–ইন্টারনেটে সেই লিংকে ক্লিক করা মাত্রই আমি দুটো ভিডিও ছবি দেখতে পেলাম। দুটি ভিডিওই স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের অনুষ্ঠান এবং সংবাদ সম্মেলনের ভিডিও। একটাতে দেখতে পেলাম, বদর বাহিনীর কমান্ডার মতিউর রহমান নিজামী ও সে ধরনের কিছু মানুষের পাশে আমাদের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বসে আছেন। দেখে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। আমার খুব জানার কৌতূহল, কী কারণে তিনি সেখানে গিয়ে বসে ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নিয়ে যখন জোর আলোচনা চলছে, তখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা মোটেও তাঁদের দায়িত্ব নয়।
সত্যি কথা বলতে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছুই করার কথা নয়। কিন্তু তারা বিচার বিভাগের পৃথককরণ সম্পন্ন করেছে (যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের বিচারপ্রক্রিয়া দেখে সেটা এ মুহূর্তে কারও বিশ্বাস হচ্ছে না) পাঠ্যপুস্তকগুলোর সংস্কার করেছে, দু-দুজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে জেলে আটকে রেখেছে, ডজন ডজন মন্ত্রী এবং ‘রাজপুত্র’দের দুর্নীতির জন্য বিচার করছে। এখন যুদ্ধারপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার কাজটি তাদের জন্যই সবচেয়ে সহজ। দেশের মানুষ তাদের কাছেই এটা আশা করে। তবে মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে থাকা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে দেখে আমি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছি।

দ্বিতীয় ভিডিওটি দেখে আমি চমকে উঠেছি, সেখানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে আছেন আমাদের নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব একটি এবং একটি। সেটি হচ্ছে নির্বাচন করা। সেই নির্বাচনের জন্য কি বেছে নিতে হলো এমন একজন মানুষকে, যিনি স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত?
বিজয়ের মাসে আমরা কি সে জন্য আমাদের আশাভঙ্গের বেদনাটুকু এই সরকারকে জানাতে পারি না?
(যাঁরা ভিডিওগুলো দেখতে চান, তাঁরা এই লিংকগুলোতে একবার ক্লিক করে দেখতে পারেন:
http://www.youtube.com/watch?v=Zc2djYrzjoY
http://youtube.com/watch?v=cjYR8rxQcD8&feature=related।)
মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, শাবিপ্রবি।